

‘সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন’ অমলেন্দু চক্রবর্তী

ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের সংকীর্ণতর দ্বৈপায়নী জগৎ থেকে দূরে সরে আসার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ‘একটা পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে কবিচিন্তের ব্যাপ্তিসাধন’- সাহিত্যের ইতিহাসে সেই পর্বকে শ্রীঅরবিন্দ ‘উৎক্রান্তির যুগ’ (a period of transition) বলে চিহ্নিত করেছেন। অতীতের যাবতীয় কাঠামো, ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ভাষা, নতুন ছন্দঃস্পন্দ ও নতুন রূপবন্ধের জন্য সেদিনকার স্রষ্টা-প্রতিভা নতুন পথে পা রেখেছিল। একটা সূক্ষ্মতর অথচ বৃহত্তর, একটা গভীর অথচ তাৎপর্যপূর্ণ, একান্ত ব্যক্তিক অথচ বৈশ্বিক জীবন-সত্য ছিল তাঁদের অস্থিষ্ঠ। ঐতিহ্যবাহী জীবন-সত্যকে নব নব আলোকে নব নব রূপায়ণের প্রেরণাই ছিল সেদিনকার শিল্প-সাহিত্যের ভিত্তিমূলে সক্রিয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ছিল, “মানবমনের যে উর্ধ্বতম প্রবণতা, তার মধ্যে আজকে ক্রমেই আরো বেশি করে দেখতে পাচ্ছি— মানুষের আত্মিক স্বরূপ ও ব্যক্তিক সত্তার প্রতি, এবং প্রকৃতির অন্তরের অধ্যাত্ম অধিষ্ঠানের প্রতি তার দৃষ্টি ব্যাপকভাবে খুলে যাচ্ছে— সে দেখতে পাচ্ছে অতি প্রাকৃত, বিশ্বজাগতিক, সার্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যকে, অথচ জীবনের উপরে, জগতের উপরে তার অধিকার সে বিন্দুমাত্র হারাচ্ছে না।” সাহিত্যে এ যুগের অন্যতম প্রতিনিধি মেরিডিথ, ফিলিপ্স, হুইটম্যান, কার্পেণটার এবং আইরিশ কবি এ, ই এবং ইয়েটস্। ইংরেজি সাহিত্য উৎক্রান্তি যুগের মূল ভাবনির্যাস যে অনন্ত আত্মানুসন্ধান, মানবাত্মার সামনে যে ব্যাপকতম সম্ভাবনা, উপলব্ধি ও উদ্ঘাটনের বলিষ্ঠতর পরিধির মধ্যে যুগযুগান্তের চিন্তা-ধারাকে আত্মসাৎ করে এক অভিনব সৃষ্টি কল্পের সূচনা ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল এক্ষেত্রে পুরোধা পথিক। বস্তুত: শ্রীঅরবিন্দই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে উৎক্রান্তি যুগের কবিদের সঙ্গে একাসনে রেখে মূল্যায়নে এগিয়ে এসেছিলেন।

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের ক্ষেত্রে বহুধামুখী ব্যাপ্তি এই আন্দোলনে ক্রমশ, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও তার প্রথম সূচনা কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছিল সাহিত্যের সুর তথা ছন্দ স্পন্দের মধ্যেই; শ্রীঅরবিন্দের মতে ছন্দ স্পন্দের একটা নতুন শক্তি আবিষ্কারের জন্য যে একটা কঠোর চেষ্টা চলছে সেইটাই হল আসন্ন পরিবর্তনের প্রথম ইংগিত।

রবীন্দ্র- প্রতিভার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রথম মৌলিকত্ব ধরা পড়েছিল তাঁর সৃষ্ট অভনব ছন্দ স্পন্দের মধ্যেই এবং প্রায় রবীন্দ্র-সমালোচকের আলোচনাতেই তা স্বীকৃত।

(১) “রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে রূপান্তর এনেছেন তা তাঁর বস্তুদানের উপর ততখানি নির্ভর করেনি, যতখানি করেছে তিনি যে ভঙ্গি যে ছন্দ যে সুর দিয়েছেন তারই উপর।”

—নলিনীকান্ত গুপ্ত

(২) “তাঁর রচনায় প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে নিবিড় সহযোগ দেখি, তা অন্যত্র দুর্লভ এবং এই সামঞ্জস্য বিধানের অধিকাংশ ভার প্রকরণের বহনীয়।”

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

উল্লিখিত দুটি মন্তব্যই আক্ষরিক অর্থে ছন্দের কাঠামো গত অঙ্গবন্ধ বা করণ কৌশল, মাত্রাবিন্যাসজনিত গতিবেগ বা দোলকেই নির্দেশ করেছে। বস্তুত এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। কেবল অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রেই নয়, ছন্দের প্রতিটি বিভাগ এবং উপবিভাগে তিনি ছিলেন যথার্থ ‘আসল পালার জনক’। কিন্তু ছন্দ মাত্রাই রয়েছে তিনটি দিক-বহিঃ, অন্তঃ, এবং অন্তঃস্থমাঙ্গ। প্রথমটিতে ধরা দিয়েছে স্থূল দেহ, তার কাঠামো; দ্বিতীয়টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধ্বনির রোল, ঝংকার এবং তৃতীয় ধাপে রয়েছে এমন একটি জিনিস যা ছন্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অতীত, যা কেবলমাত্রই অনুভবগম্য শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ‘Some one dancing upstairs’ অথবা ‘Great Soul rhythm’ অথবা ‘The voice of the inmost truth’.

রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোচনায় এই তৃতীয় ধাপ অর্থাৎ সুর ছন্দ যেখানে কথার রূপের ভারে ভাস্কর্যের অতিস্পষ্টতা পায়নি- তার মূল্যায়ন প্রায় উপেক্ষিত। অথচ সহৃদয় রবীন্দ্রপাঠক মাত্রই অনুভব করবেন আক্ষরিক অর্থেই রবীন্দ্রবিসৃষ্টিতে ‘সুর’, ‘ছন্দ’ ‘দোল’, ‘ধ্বনি’, ‘বীণা’, ইত্যাদি শব্দগুলি কেবলমাত্র বার বার আবর্তিত হয়নি— এরও একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। বস্তুতঃ বিশ্বের যোগে রবীন্দ্র-ছন্দের যেখানে সার্থকতা যে যোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টির অমরত্ব- সেখানেই এই শব্দগুলির অন্বয় অনুসন্ধান করতে হবে। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, “যে প্রাণের স্পন্দনে এই বিশ্ব বিকশিত, মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, বাহ্য আকারের বা কাঠামোর পিছনে যে নিভৃত আবেগ উদ্বেলিত, কবি কান পাতিয়া তাহারই ছন্দ তাহারই সুর শুনিতে ধরিতে চাহিতেছেন।” কবি যেন স্থূল শব্দের কোলাহলমুখর হুলস্থূলের জগৎ নিয়ে খেলতে খেলতেই একে অতিক্রম করে ভাবে ও ভঙ্গিতে পৌঁছে গেছেন একটা সুস্পষ্টতর লোকে— যেখানে সুর ছন্দ সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছে। সেই আদিম ভৈরবী সুর, সৃষ্টির

সেই প্রথম স্পন্দনকে কবি কান পেতে শুনেছেন, ভাষায় বাজায় করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে— ‘বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।’ তাঁর প্রতিভার একটি প্রধান বিলাস শক্তিই হল সেই আদিম সুরস্পন্দনকে ভাষা দেওয়া; তাঁর সিসৃক্ষু, জীবন অতিবাহিত হয়েছে “বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে”—ই। কবি হচ্ছেন সেই অশ্রুত সুরের জগতে সুর-বিলাসী পথিক—

‘তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে-চিও

যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।’

এখানে ‘সুর’ একদিকে চিন্ময় বিশ্বের সমাহিত অন্তস্পন্দন, শ্রী অরবিন্দ যাকে বলেছেন ‘The vibrations of the Infinite’ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা ‘নটরাজের নৃত্যের তাল’; অপরদিকে তুরীয় সত্য, চরম বেদনা, পরম প্রেম, অনাবিল আনন্দও বটে। তাই সুরের গুরু বারে বারে এসেছেন গুনিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙাতে। শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন— “প্রেম হল মূল স্বর, আনন্দ হল সংলাপ শক্তি হল সুর- জ্ঞান হল গায়ক আর অনন্ত বিশ্ব হল রচয়িতা ও শ্রোতা।” রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলতে পারেন তাঁর ঈশ্বর হচ্ছেন সুরকার, বীণাবাদক, গায়ক— ‘তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী’; আর জগৎ হচ্ছে সেই সুরকারেরই সৃষ্টি, যেন এক সুর-লহরী; কবির ভাষায়—

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,

সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,

পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে

বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী ॥

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথকে যে অনেকে ঋষি বলেছেন তার মূল কারণও এখানেই নিহিত। তৈত্তিরীর আরণ্যকে আছে, “যাঁর কাছে ব্রহ্মী বাক্ ‘আসেন’, বিশ্বব্যাপী স্পন্দন যাঁর আত্মস্পন্দন হয়ে ধরা দেয় তিনিই ঋষি হন।’ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বৈদিক ঋষিদের উত্তরসূরী। তাই কবির আকুল প্রার্থনা—

বিশ্বকবির চিন্তমাঝে

ভুবনবীণা যেথায় বাজে

জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়কে সেথায় লুটে।”

কখনো বা কবির সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে যায় অদিতির হৃৎস্পন্দনের মধ্যে- ‘এ গগণ-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।’

উৎক্রান্তি যুগের কবি হুইটম্যান সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, “হোমরের পরে সবচেয়ে বেশি যদি কেউ হোমরীয় কণ্ঠের অধিকারী হয়ে থাকেন তবে তিনি হলেন হুইটম্যান। হোমরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যটি এই যে, হোমরের মতই তাঁর দৃষ্টি জীবনের এমন একটা কোনো আদিম মূলীভূত উপাদানের কাছে এসে পৌঁছেছে, যা তাঁর সমস্ত

উজ্জ্বলই প্রেরণা জোগাচ্ছে, এমন কি তাঁর একান্ত প্রাকৃত একান্ত গদ্যময় উজ্জ্বলও পিছনে রয়েছে।” আমার মনে হয় হোমরের স্থানে ঋগ্বেদের ঋষিদের বসিয়ে একই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। কবির বিশ্ব যে সুর-রণনে নিয়ত ঝংকারিত, যে ছন্দের ঝরণাধারায় নিরন্তর অভিযুক্ত সৃষ্টির সেই প্রথম কম্পন, সেই আদিম ভৈরবী সুর প্রথম ঋগ্বেদের ঋষিরাই কান পেতে শুনে ছিলেন- ‘যজ্ঞেন বাচ: পদবীৰ্যম্ আয়ন্ তাম্ অম্ববিন্দন-ঋষিষু প্রবিস্তাম্’ (১০।৭১।৩)। সেই প্রথম বাক্ যা ঋষিদের হৃদয়সমুদ্রের গভীরে একদিন হিমালয়-তরঙ্গ তুলেছিল তাই শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে সংক্রমিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। ঋষিদের সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন- “As the eyes of the sage are opened to the light, so is his ear unsealed to receive the vibrations of the Infinite; from all the region of the truth there comes thrilling into him to word which becomes the form of him thoughts.” কেবল দৃষ্টি নয়, রবীন্দ্রনাথও লাভ করেছেন সেই তাই শুনতে পেয়েছেন বিশ্বপ্রাণে মন্দিত সেই গুরু গুরু ডমরুধ্বনি— সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে ওঠে সেই সংগীত ‘যে গান কানে যায় না শোনা’- ‘সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত-গান’ অথবা শুনতে পান-

‘বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—

অনলকমল-মাঝে, জ্যেৎস্নারজনী-মাঝে

কাজলঘন-মাঝে, নিশি আঁধার-মাঝে,

কুসুমসুরভি-মাঝে বীনরণন শুনি যে—

প্রেমে প্রেমে বাজে।’

বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সৃষ্টির মূল সত্য, তার ভাব নির্যাসের সিংহ-ভাগই ধারণ করে রয়েছে এই সুর ঝংগার, এই ছন্দঃস্পন্দন। বোদ্ধার ভাষায়- “রবীন্দ্র সঙ্গীত কেন গাই? অনন্ত আকাশ আর অনন্তা পৃথিবীকে সুরের বাঁধনে মহাবিহঙ্গের পাখা কোন কাঁপনে থর থবিয়ে উঠেছিল সেই কাঁপনটিকে ধরতে জানতে, তার সঙ্গে একাকার হতে।” বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই সুর স্পন্দনকেই গ্রীকরা বলেছিলেন ‘music of the spheres’, যা হচ্ছে সৌন্দর্যের আদি আবেগ, মূল ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য বিচারে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, প্রাণের যে প্রথম স্পন্দনে বিশ্বসৃষ্টি রূপগ্রহণ করতে শুরু করেছিল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে তথা তার অন্তর্নিহিত সুরের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির সেই আদিমতম দোল “তখনকার সেই প্রথম দোল, সেই প্রথম তান, সেই নাদ ব্রহ্মই যেন রবীন্দ্রনাথের ইস্ট এবং ইস্টের সাধনায় অপরূপ সাফল্যই তাঁহার কবিত্বের

বৈশিষ্ট্য ও মহিমা।” ঋগ্বেদের ঋষিরা যে সুরে বলেছিলেন- ‘ইন্দো সমুদ্রম্ ইজ্যয় পবস্ব বিশ্বমেজয়’

(ঋগ্বেদ ৯।৩৫।২)

‘কি মহাকাঁপনে কাঁপাও বিশ্ব
দোলাও সিন্ধু, ইন্দু, বও।’

(গৌরী ধর্ম পালের অনুবাদ)

রবীন্দ্রনাথ একই সুরে গেয়েছেন ‘আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে
দোলাও।’

বেদ উপনিষদের পর সৃষ্টির সেই অন্তস্পর্শ ভারতীয় সাহিত্যে ছিল একান্ত অশ্রুত। মহাকাব্যের কঠোর বস্তু-তন্ত্রতার যুগে গীতাকে বাদ দিলে এই সুর ঝংকার, এই অনাদি সঙ্গীত গান বিলুপ্ত প্রায়। বৈষ্ণবের ভক্তি আন্দোলনে, বাউলের ক্ষেপামিতে এই সুরজগৎ পুনরাবিষ্কৃত হলেও ধারকের অভাবে তা ছিল একান্তই ক্ষণজীবী। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অলোক সামান্য। জ্ঞানৈক সমালোচকের মন্তব্য দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানতে পারি। তিনি শ্রীঅরবিন্দের ‘Sights sound-waves breaking from the soul's great deeps’ অংশটুকু উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন— “এই শব্দ-রূপকে এক করে রবীন্দ্রনাথ নটরাজের পায়ে বেঁধে দিলেন একটি অপরূপ শব্দ জ্যোতি-সঞ্জীব! আলোর নূপুর। তব পদ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভাণু।”

গ্রন্থ নির্দেশ:

- ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ‘অখণ্ড গীতবিতান’, বিশ্বভারতী, ১৩৯৪।
- ২। শ্রীঅরবিন্দ: ‘The Future Poetry’ Pondicherry, 1972.
- ৩। ,, On the Veda’ Pondicherry 1972.
- ৪। ,, ‘চিন্তা-কণা ও দৃষ্টি-নিমেষ’, পণ্ডিচেরী, ১৯৭২।
- ৫। নলিনীকান্ত গুপ্ত: ‘রচনাবলী’, ১ম খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৭৫।
- ৬। ,, : ‘রচনাবলী’ ২য় খণ্ড, কোলকাতা, ১৯৭৬।
- ৭। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ’, কোলকাতা ১০৯০।
- ৮। গৌরী ধর্মপাল ‘বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ’, কোলকাতা, ১৯৮১।